দিল্লি
সিটি অফ জ্বিনস

উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল

অনুবাদ
আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

অনুবাদকের কথা

'সিটি অফ জ্বিনস'-এর লেখক উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল এর জন্ম স্কটল্যান্ডে। তরুণ বয়সেই লেখক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তার 'ইন জানাদু' ১৯৯০ সালে যখন 'ইয়র্কশায়ার পোস্ট বেস্ট ফার্স্ট ওয়ার্ক অ্যাওয়ার্ড' এবং 'স্কটিশ আর্ট কাউন্সিল স্প্রিং বুক অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে তখন তার বয়স মাত্র বাইশ বছর। ১৯৮৯ সালে দিল্লিতে এসে চারবছর অবস্থান করেন 'সিটি অফ জ্বিনস'-এর উপকরণ সংগ্রহ ও গবেষণা করতে। বইটি প্রকাশের পর তিনি 'টমাস কুক ট্রাভেল বুক অ্যাওয়ার্ড' এবং 'সানডে টাইমস ইয়ং ব্রিটিশ রাইটার অফ দি ইয়ার অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। তার তৃতীয় বই 'ফ্রম দি হোলি মাউন্টেন: অ্যা জার্নি ইন দি শ্যাডো বাইজানটাইন' ১৯৯৭ সালে 'স্কটিশ আর্ট কাউন্সিল অটাম বুক অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে।

ভারতের যেকোনো নগরীর চাইতে দিল্লির সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ইতিহাসের স্তর অনেক বেশি এবং প্রতিটি স্তরকে উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল সাফল্যের সাথে তুলে এনেছেন 'সিটি অফ জ্বিনস' এ। গল্প বলার মতো করে তার উপস্থাপনের কৌশল পাঠককে অনায়াসে ইতিহাসের অলিগলিতে নিয়ে যায়। লিখতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের কোনো চরিত্রের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ প্রদর্শন করেননি, কারো প্রতি রূঢ় বা নমনীয় হননি। নিজের কৌতূহল, ঔৎসুক্য পূরণের পাশাপাশি পাঠককে খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল 'সিটি অফ জ্বিনস' এর উপকরণ সংগ্রহে নিয়োজিত হওয়ার নয় বছর পূর্বে একবার ভারতে এসেছিলেন পর্যটক হিসেবে। তখনই তার মাথায় ঝোঁক চাপে দিল্লির ওপর গবেষণাধর্মী কিছু লেখার। লন্ডনভিত্তিক একটি সংবাদপত্রের দিল্লি সংবাদদাতা হিসেবে চার বছর ভারতে অবস্থানের অনুমতি পেয়ে তিনি তার অনুসন্ধান চালান। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি দিল্লির লাইব্রেরি, আর্কাইভ ও জাদুঘরে গেছেন, ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন পরিদর্শন করেছেন, দিল্লির ইতিহাসের সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছেন।

দিল্লির ওপর খুশবন্ত সিং-এর ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস 'দিল্লি' অনুবাদের পর্যায়ে গ্রন্থটিতে উল্লিখিত প্রতিটি ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। এর ফলে সেসব স্থান ও বর্ণিত চরিত্রের সাথে এক ধরনের সংশ্লিষ্টতা বোধ করেছি। তাতে অনুবাদ স্বচ্ছ ও সাবলীল হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। পাঠকরা অনুবাদকর্মটি

সাদরে গ্রহণ করেছেন। উইলিয়াম ড্যালরিম্পেলের 'সিটি অব জ্বিনস' দিল্লি নগরী বিশেষ করে পুরনো দিল্লির আরও বিস্তারিত এবং খুঁটিনাটি বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। ইতিহাসে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পায় না তার অনুসন্ধানে সেগুলোও গুরুত্ব পেয়েছে। মূল গ্রন্থটি পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাংলাভাষী পাঠকদের কাছেও 'সিটি অব জ্বিনস' অনুরূপ সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ভূমিকা

ফিরোজ শাহ কোটলার এক খানকায় প্রথমবারের মতো এক সুফির সঙ্গে আমার দেখা হয়। 'পির সদর-উদ-দীনের' তীক্ষ্ণ চোখ এবং ময়নার বাসার মতো অবিন্যস্ত দাড়ি। এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আমাকে গালিচায় বসার অনুমতি দিলেন, চা পানে আপ্যায়িত করলেন এবং জ্বিন সম্পর্কে আমাকে বললেন।

তিনি জানালেন যে, পৃথিবী যখন সবেমাত্র সৃষ্টি হয়েছে তখন মহান আল্লাহ কাদামাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেন। এছাড়া আরেকটি প্রজাতির সৃষ্টি করেন আগুন থেকে এবং তা হচ্ছে জ্বিন। জ্বিনরা চেতনাসম্পন্ন, মানুষের চোখে অদৃশ্য। তাদেরকে দেখতে হলে রোজা রাখতে হবে এবং টানা একচল্লিশ দিন ইবাদত করতে হবে। সদর-উদ-দীন হিমালয় পর্বতের পাদদেশে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ধ্যানে বসেছিলেন এবং কোনো আহার্য গ্রহণ করেননি। এরপর তিনি দীর্ঘ একচল্লিশ দিন যমুনা নদীতে তার গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে কাটিয়েছেন।

এক রাতে তিনি এক কবরস্থানে যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন জ্বিনদের বাদশাহ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। 'তার রং মিশকালো। গাছের মতো উঁচু এবং কপালের মাঝ বরাবর একটি চক্ষু'—পির সাহেব বলেন। 'আমি যা চাইবো তাই আমাকে দিতে চান তিনি, কিন্তু আমি তার কাছ থেকে কিছু নিতে বারবার অস্বীকার করেছি।'

'আপনি কি আমাকে একটি জ্বিন দেখাতে পারেন?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'অবশ্যই', পির সাহেব উত্তর দেন। 'কিন্তু দেখলে আপনি দৌড়ে পালাবেন।'

আমার বয়স তখন সতেরো বছর। নর্থ ইয়র্কশায়ারের সুদূর এক উপত্যকায় দশ বছর স্কুলে পড়াশুনার পর হঠাৎ করেই আমি ভারতে চলে আসি। শুরু থেকেই ভারতের বিশাল রাজধানী আমাকে মুগ্ধ করে। দিল্লির মতো কোনো শহর আমি আগে কখনো দেখিনি। দিল্লিকে প্রথমে মনে হয়েছে ধনবান মানুষ ও আতঙ্কে পূর্ণ শহর হিসেবে; প্রশস্ত রাজপথ, অসংখ্য প্রাসাদ, উন্মুক্ত স্থান, গম্বুজ, নৈরাজ্য, গাদাগাদি মানুষ, কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠা ধোঁয়া, মসলার সুগন্ধ।

এছাড়া, খুব শিগ্‌গির আমি আবিষ্কার করলাম, শহরটি সম্পর্কে অসংখ্য কাহিনি—যা ইতিহাস থেকে দূরে, রূপক ও উপকথার গভীরে সাজানো। দিল্লির

বাটপাড়দের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে আমার বন্ধুরা গোয়া চলে গেলেও দিল্লি আমাকে আটকে রেখেছিল শক্ত বন্ধনে। আমি রয়ে গেলাম এবং দুস্থদের একটি আশ্রমে আমার কাজও জুটে গেল। আশ্রমটি শহরের উত্তর প্রান্তে।

আশ্রমে আমাকে একটি রুম বরাদ্দ করা হলো যেখান থেকে পৌর আবর্জনা স্তূপ করার ভাগাড় দেখা যায়। সকালে আমি দেখেছি আবর্জনা থেকে জীবিকা সংগ্রহকারীদের ভিড়। মাথার ওপরে তামাটে আকাশে চক্রাকারে ঘুরতো শকুন। বিকেলে আশ্রম ঝাড়ু দেওয়ার পর আশ্রিতরা যখন ঘুমাতে যেত, তখন আমি বের হয়ে পড়তাম এবং আমার অনুসন্ধানে লিপ্ত হতাম। একটি রিকশা নিয়ে পুরনো দিল্লির পথ ধরতাম; সরু গলি, উপগলি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চারপাশের বাড়িগুলোকে অনুভব করতাম।

গ্রীষ্মে আমি ঘিঞ্জি জায়গার পরিবর্তে স্থপতি লুটিয়েনস (স্যার এডউইন ল্যান্ডসির লুটিয়েনস, ১৮৬৯-১৯৪৪) এর দিল্লিতে ঘুরতে পছন্দ করতাম। জ্বলন্ত সূর্যের নিচে নিম, অর্জুন গাছের ছায়ায় হাঁটতাম। অনুচ্চ দেওয়ালবেষ্টিত হলুদ গুলমোহর ফুলে ঢাকা ঝোপশোভিত উদ্যানসহ সাদা রঙের বাংলো অতিক্রম করতাম।

পুরনো ও নয়াদিল্লির ধ্বংসাবশেষ আমাকে আকৃষ্ট করত। নগরের পরিকল্পনাবিদরা নতুন নতুন এলাকা গড়ে তোলার জন্যে যত কঠোর পরিশ্রমই করুক না কেন, নয়াদিল্লি আসলে নতুন নয়। নয়াদিল্লি গড়ে উঠেছে পুরনো শহর, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এবং বিভিন্ন রাজবংশের গোরস্থানকে ঘিরেই। অনেকের মতে, সাতটি দিল্লির মৃত্যু ঘটেছে এবং এখনকার নগরী অষ্টম। অনেকে পনেরো বা একুশটি দিল্লির অস্তিত্বের কথা বলে। কিন্তু কারো মধ্যে দ্বিমত নেই যে, দিল্লিতে ধ্বংসস্তূপের সংখ্যা অনেক।

কিন্তু দিল্লির চমৎকারিত্ব হচ্ছে, ছড়ানো ছিটানো নগরীর মধ্যে মানুষের ধ্বংসাবশেষও আছে। দিল্লির কিছু এলাকা বিভিন্ন শতাব্দীতে, বিভিন্ন সহস্রাব্দে কোনোভাবে চমৎকারভাবে সংরক্ষিত ছিল বলে মনে হয়। পাঞ্জাব থেকে আগত ইমিগ্রান্টরা দিল্লি নগরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নতুন সবকিছুর প্রতি তাদের ঝোঁক লক্ষণীয়। লোধী গার্ডেনে বিকেলে পায়চারিরত বৃদ্ধ মেজররা হয়তো অর্ধশতাব্দী আগে অবসর নিয়েছে। তাদের মোচড়ানো গোঁফ ও রসিকতার সুরে কথা বলার ঢঙে মনে হবে যেন তারা ১৯৪৬ সালের মাঝেই আটকা পড়ে আছে। পুরনো দিল্লির অনেক হিজড়া দরবারি উর্দুতে কথা বলে, যেন তারা নিজেদেরকে মোগল দরবার থেকে এখনো খুব বেশি বিচ্ছিন্ন মনে করে না। নিগমবোধ ঘাটের সাধুদের দেখে আমার মনে হয়েছে যেন তারা মহাভারতের কাহিনির প্রথম দিল্লি ইন্দ্রপ্রস্থের আটকে পড়া নাগরিক।

সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ প্রতিনিধিত্ব করছে দিল্লিকে। বিভিন্ন সহস্রাব্দ সহাবস্থান করছে। বিভিন্ন যুগকে মনে ধারণ করে মানুষ একই পথ ধরে হাঁটছে, একই পানি পান করছে এবং একই ধূলিতে মিশে যাচ্ছে।

কিন্তু পির সদর-উদ-দীনের সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত আমি নগরীর নতুন জীবন অব্যাহত থাকার গোপন রহস্য উপলব্ধি করতে পারিনি। পির সদর-উদ-দীনের মতে, দিল্লি ছিল জ্বিনদের নগরী। যদিও হামলাকারীরা বারবার এ নগরী জ্বালিয়ে দিয়েছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী নগরী জ্বলেছে, তবু নগরী পুনর্নির্মিত হয়েছে। যেন প্রতিবার আগুন থেকে শতবর্ষজীবী মরু পাখির মতো নগরীর উত্থান হয়েছে। ঠিক হিন্দুরা যেমন বিশ্বাস করে যে, পবিত্রতা অর্জন না করা পর্যন্ত বারবার দেহের পুনর্জন্ম হবে। সেভাবেই মনে হয় যেন দিল্লি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুনর্জন্ম লাভ করে যাবে। এর কারণ হিসেবে পির সদর-উদ-দীন বলেছেন যে, জ্বিনরা দিল্লিকে এত ভালোবাসে যে, এ নগরীকে তারা শূন্য বা বিক্ষিপ্ত দেখতে চায় না। এখন নগরীর প্রতিটি বাড়ি, রাস্তার প্রতিটি মোড়ে জ্বিনরা আছে। তাদেরকে কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু কেউ নিবিষ্টচিত্ত হলে তাদের অনুভব করতে পারবে। তাদের ফিসফিসানি শুনতে পারবে অথবা ভাগ্য প্রসন্ন হলে মুখের ওপর তাদের উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করতে পারবে।

দিল্লিতে এসে আমার মনে হয়েছে যে, আমি একটি গ্রন্থ রচনার বিষয় খুঁজে পেয়েছি: সময়ের মাঝে অস্পষ্ট এক নগরীর চিত্র, যে নগরীর বিভিন্ন যুগ একটি পাত্রে টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে আছে এবং যে নগরী জ্বিনদের নগরী।

প্রথমবার দিল্লি অবস্থানের পাঁচ বছর পর আমি আবার দিল্লিতে ফিরে আসি। তখন আমি বিবাহিত। স্ত্রী অলিভিয়াকে নিয়ে আমি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারের কাছে এক বাড়ির সর্বোচ্চ তলায় একটি ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া নিই। আমাদের ল্যান্ডলেডি ছিলেন মিসেস পুরী।

উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল

এক

ফ্ল্যাটটি বাড়ির সর্বোচ্চ তলায়, মিসেস পুরীর ছাদের সঙ্গে যেন কোনোমতে আটকে তৈরি করা হয়েছে। সিঁড়িঘর ভ্যাপসা, সেপ্টেম্বরের উত্তাপে বাতাসহীন ফ্ল্যাটের ছাদ ঢেউটিনের।

দরজা খোলার পরের দৃশ্য যেন 'গ্রেট এক্সপেক্টেশন' ছায়াছবির: সর্বত্র ধূলির পুরু আস্তরণ, রুমের কোনায় চড়ুইপাখির বাসা। চারদিকে মাকড়সার জাল, দেওয়ালের কোনাগুলোতে প্রচুর ঝুল জমে আছে। মিসেস পুরী দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ছোট্ট, সামনে ঝুঁকানো শরীর, সালোয়ার কামিজ পরনে।

'এর আগের ভাড়াটে খুব বেশি বাইরে যেত না', তার হাতের লাঠি দিয়ে মাকড়সার জাল ছিন্ন করে বললেন। 'তিনি তেমন ভদ্রলোক ছিলেন না।' অলিভিয়া কাপবোর্ডে ফুঁ দিল; ধূলি এত পুরু হয়ে বসেছে যে, কেউ চাইলে তাতে নাম লিখতে পারে।

আমাদের ল্যান্ডলেডি একজন গ্রান্ডমাদার হলেও শিগ্‌গিরই নিজেকে দুর্দান্ত মহিলা বলে প্রমাণ করলেন। তিনি লাহোর থেকে আগত শিখ। দেশ ছাড়ার সময় তিনি তার পুরনো বাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন এবং ১৯৪৭ সালের ডামাডোলে সবকিছু হারিয়েছেন। তিনি দিল্লিতে পৌঁছেন একটি গরুর গাড়িতে। বিয়াল্লিশ বছর পর তিনি নিঃস্ব উদ্বাস্তু থেকে নিজেকে রূপান্তরিত করেছেন পাঞ্জাবি প্রিন্সেস হিসেবে। বাস্তবিকপক্ষেই তিনি এখন বিত্তশালী। দিল্লির সব জায়গায় তার বাড়ি আছে এবং গরুর গাড়ির বদলে নতুন মারুতি গাড়ির একটি বহর আছে তার। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিসেস পুরী ব্যবসায়িক স্বার্থও নিয়ন্ত্রণ করেন। সেসবের মধ্যে রয়েছে শিষ্টাচার শিক্ষাদান সম্পর্কিত ভারতের প্রথম কলেজ গ্লোরিয়ানা ফিনিশিং স্কুল। গ্রামের মেয়েদের ছুরি, কাঁটাচামচ ব্যবহার, সুন্দরভাবে লিপস্টিক লাগানো, পরিবেশ ও আবহাওয়া সম্পর্কে মার্জিত কথোপকথন শিক্ষা দেওয়ার চমৎকার প্রতিষ্ঠান।

মিসেস পুরী এসব অর্জন করেছেন কঠোর পরিশ্রম ও পুরনো ধারার মিতব্যয়িতার সমন্বয় ঘটিয়ে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমেও তিনি সচরাচর তার এয়ারকন্ডিশনার চালু করেন না। শীতকালে দিনে এক ঘণ্টার জন্যে তার ইলেকট্রিক হিটার জ্বালান। আমাদের ফেলে দেওয়া সংবাদপত্র তিনি ব্যবহার করেন। রাতে কখনো পার্টি থেকে বিলম্বে ফিরলেও তাকে বসে থাকতে দেখি। জানালায় কালো ছায়া হয়ে রপ্তানির জন্য সোয়েটার বুনছেন। ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি বলেন, 'স্লিপ ইজ সিলভার, বাট মানি ইজ গোল্ড।'

তার এসব বিষয় খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু শিগ্‌গির আমরা ঝাঁকুনি খেলাম যে, তিনি নিজের ওপর যে নিয়ম-শৃঙ্খলা আরোপ করে রেখেছেন তার ভাড়াটেরাও তা মেনে চলুক তা তিনি চান। তার বাড়িতে আসার মাত্র এক সপ্তাহ পর একদিন সকালে পানির ট্যাপ খুলে পানি পেলাম না এবং খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে, পানির সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিচে নেমে গেলাম সমস্যা সমাধান করতে। মিসেস পুরী ঘুম থেকে উঠে কয়েক ঘণ্টা গুরুদুয়ারায় কাটিয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি এখন তার সকালের নিয়মিত সেব্য পানীয় ভাতের মাড় পান করছেন। 'সকাল থেকে আমাদের ফ্ল্যাটে পানি নেই, মিসেস পুরী।'

'তা নয়, মি. উইলিয়াম। আমি বলছি, কেন নেই।'

'কেন মিসেস পুরী?'

'আপনার বাসায় অনেক গেস্ট আসছে, মি. উইলিয়াম। আর তারা সবসময় বাথরুমে যাচ্ছে।'

'কিন্তু এর সঙ্গে পানি সরবরাহ বন্ধ হওয়ার সম্পর্ক কী?'

'কাল রাতে আমি সাতবার ফ্লাশ করার শব্দ শুনেছি', মিসেস পুরী ফ্লোরে তার লাঠির টোকা দিয়ে বললেন। 'সেজন্য প্রতিবাদ হিসেবে আমি পানি বন্ধ করে দিয়েছি।'

আমাদের অপরাধের গভীরতা উপলব্ধি করতে দেওয়ার জন্য তিনি একটু থামলেন।

'লোকজন যদি একরাতে সাতবার ফ্লাশ করে, তাহলে ভারতে যে পানির ঘাটতি থাকবেই তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে?'

তার স্বামী মি. পুরী সুদর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তার মুখ জুড়ে দীর্ঘ দাড়ি এবং ধাতব ফ্রেমের চশমা। তিনি সবসময় যথেষ্ট বন্ধুসুলভ—আমরা যখন তাকে অতিক্রম করে যাই, তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকান। আমরা যখন ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিই তখন মিসেস পুরী আমাদেরকে একপাশে টেনে নিয়ে

সতর্ক করেন যে, ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যার পর যে দাঙ্গা হয়েছিল এরপর থেকে তার স্বামী আর আগের মতো ভালো, শান্ত নেই।

ঘটনাটি বরং একদিক থেকে বীরত্বপূর্ণ কাহিনির জন্ম দিয়েছে। কিছুসংখ্যক দাঙ্গাকারী যখন তাদের বাড়ির সামনের দরজা ভেঙে ফেলতে শুরু করে তখন মি. পুরী তার চাকর লাড্ডুকে বলেন তাকে ভগ্নপ্রায় দরজার পাশে নিয়ে যেতে। রক্ত টগবগিয়ে তোলার মতো চিৎকার করে তিনি তার পুরনো রিভলভার তাক করে দরজার ফাঁক দিয়ে সবগুলো গুলি ছোড়েন। দাঙ্গাকারীরা দৌড়ে পালায় এবং সামনের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে হামলা করে। পুরী পরিবার সে যাত্রা রক্ষা পান। সেদিন থেকে বৃদ্ধ লোকটি একনিষ্ঠ শিখ জাতীয়তাবাদীতে পরিণত হয়েছেন। তিনি বলেন, 'প্রত্যেকের তার নিজস্ব আবাসভূমি থাকা প্রয়োজন। মুসলমানদের পাকিস্তান আছে, হিন্দুদের হিন্দুস্থান আছে। পাঞ্জাব আমাদের আবাসভূমি। আমি বয়সে তরুণ হলে ভিন্দ্রানওয়ালের সঙ্গে যোগ দিয়ে হিন্দু কুকুরদের বিরুদ্ধে লড়ই করতাম।'

'এ শুধু কথার কথা', মিসেস পুরী উত্তর দেন।

'মৃত্যুর পূর্বে আমি স্বাধীন খালিস্তান দেখে যাব।'

'তুমি দিবাস্বপ্ন দেখছো। আর ক'বছর বাঁচবে?'

'পাঞ্জাব আমার আবাসভূমি।'

'তিনি পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করে থাকতে পারেন', মিসেস পুরী বলেন। 'কিন্তু তার পক্ষে এখন আর গ্রামের জীবনে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি ফ্লাশ টয়লেট, স্টার টিভি পছন্দ করেন। সবাই তা করে। এসব বিলাসিতার স্বাদ একবার পেলে কেউ কি তা ত্যাগ করতে পারে?'

রায়টের পর থেকে মি. পুরী কেমন নির্জীব নির্লিপ্ত হয়ে গেছেন। একদিন হয়তো তিনি পুরোপুরি বিনম্র থাকেন, পরদিনই হয়তো অদ্ভুতভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এরকম মুহূর্তে তার সাথে আলোচনা কিছুটা অবাস্তব ধরনের হয়ে যায়।

মি. পুরী: 'মি. উইলিয়াম, এই মুহূর্তে আপনার খচ্চরগুলোকে আমার রুম থেকে বের করে নিন।'

উইলিয়াম: কিন্তু আমার তো কোনো খচ্চর নেই মি. পুরী!

মি. পুরী: বাজে কথা! তাহলে কীভাবে আপনি ট্রাংকগুলো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তুললেন?

যা হোক, সেখানে আমাদের প্রথম মাসে মি. পুরীর আচরণ অত্যন্ত ভালো ছিল। শুধু আমার স্ত্রীকে দু-বার বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া ছাড়া তিনি চমৎকার শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছেন।

বর্ষাকাল তেমন ভালো কাটেনি। সাধারণত দিল্লিতে সেপ্টেম্বর মাস অত্যন্ত উর্বর এবং মাটি তরতাজা ও সদা বিধৌত থাকে। কিন্তু আমরা যে বছর এলাম তার আগে প্রচণ্ড দাবদাহ গেছে। বর্ষণ ছিল মাত্র তিন সপ্তাহ। এর ফলে সর্বত্র ধূলি ধূসরিত এবং নগরীর বৃক্ষ ও ফুলপাতা দেখে মনে হয়েছে যেন এসবের ওপর হালকাভাবে ট্যালকম পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও ভ্যাপসা গরমে বাতাস আর্দ্র এবং ঘর্মাক্ত কলেবরে আমরা আমাদের জিনিসপত্র খুলছিলাম ফ্ল্যাট গোছানোর জন্যে। দরজার বেলে ভারতের জাতীয় সংগীত এবং 'ল্যান্ড অব হোপ অ্যান্ড গ্লোরি' দুটির সুরই বাজে। ছাদের ওপর থেকে নিচে সুন্দর গোলাকৃতির ভবন দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম, ওটি একটি মন্দির, কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে, আসলে ভবনটি স্থানীয় পয়ঃপ্রক্রিয়া কেন্দ্র।

সম্ভবত ভারতে এসে বসবাসের অদ্ভুত চিন্তার চেয়েও যা সম্ভবত সবচেয়ে অদ্ভুত, তা হচ্ছে গৃহস্থালি কাজে হঠাৎ করে অনেকের সহায়তার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়া। দিল্লিতে আগমনের পূর্বে অক্সফোর্ডের সীমিত আবাসিক সুবিধার মধ্যে বাস করেছি। এখন আমাদেরকে এমন জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হবে, যেখানে দুটি রুম হলেও প্রয়োজনের তুলনায় অধিকসংখ্যক চাকরের উপস্থিতি থাকবে। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আমাদের চাকরের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মিসেস পুরী ব্যাখ্যা করলেন যে, গৃহস্থালি কাজে লোক নিয়োগ বেদনাদায়ক আবশ্যকতা, যার ওপর নির্ভর করে তার বাড়ির মর্যাদা।

ফ্ল্যাটে প্রথম রাতের প্রথম ঘণ্টাগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে ব্যয় করে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে রাত দুটায় আমরা বিছানায় যাই। পরদিন ঘুম থেকে উঠতে সাড়ে সাতটা বেজে যায়। তাও ঘুম ভাঙে দরজার বেলের সুরে। ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলে মি. পুরীর বেয়ারার লাড্ডুকে দেখলাম। তার হাতে ট্রে। ট্রে'র ওপর দুধপূর্ণ দু-গ্লাস ভারতীয় চা।

'ছোটা হাজরি, সাহেব', লাড্ডু বলল। বেড টি।

'হোয়াট এ নাইস জেসচার, কি চমৎকার সৌজন্য,' অলিভিয়ার দিকে ফিরে বললাম। 'মিসেস পুরী আমাদের জন্য চা পাঠিয়েছেন।'

'আমার মনে হয়, তিনি দু-ঘণ্টা পর পাঠালে ভালো হতো।' অলিভিয়া বিছানা থেকে উত্তর দিলো।

আমি চা শেষ করে আবার শুয়ে পড়লাম। দশ সেকেন্ড পর ভারতীয় জাতীয় সংগীতের সুর বাজতে শুরু করল দরজার বেলে। বিছানা ছেড়ে আবার দরজা খুললাম। বাইরে দাঁড়ানো পানের রসে ঠোঁট লাল করা শীর্ণকায় এক ব্যক্তি। তার মাথায় মাফলার জড়ানো এবং গরম সত্ত্বেও গায়ে বোতাম লাগানো পুরু জ্যাকেট। আমি আগে তাকে দেখিনি।

'আমি মালি', লোকটি বলল। বাগান পরিচর্যাকারী। সে মাথা নত করে আমাকে পাশ কেটে কিচেনে গেল। বেডরুম থেকে দেখতে পাচ্ছি সে ব্যস্তভাবে পা ফেলছে, বালতিতে পানি ভরে ছাদের ওপর টবে রাখা গাছে পানি ছিটাচ্ছে। একসময়ে সে বেডরুমের দরজায় খটখট আওয়াজ তুলে আমাকে বুঝতে দিলো যে, সে তার কাজ শেষ করেছে। এরপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। মালি চলে যাবার পর একে একে আবির্ভূত হলো, সুইপার মূর্তি, ধোপা প্রসাদ এবং সবশেষে মিসেস পুরীর নেপালি বাবুর্চি বাহাদুর। আমি ঘুমানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে নিচে গেলাম।

'মিসেস পুরী', আমি বললাম। 'সকাল সাড়ে সাতটা থেকে আমার ফ্ল্যাটে অদ্ভুত সব লোক প্রবেশ করছে আর বের হচ্ছে।'

'আমি জানি, মি. উইলিয়াম', মিসেস পুরী উত্তর দিলেন। 'লোকগুলো আপনার চাকর।'

'কিন্তু আমার তো কোনো চাকরের প্রয়োজন নেই।'

'সবারই চাকর আছে', মিসেস পুরী বললেন। 'আপনারও চাকর থাকতে হবে। এই লোকগুলো তো এজন্যই আছে।'

আমি বিস্মিত হলাম। 'কিন্তু আমাদের কি এতগুলো লোকের আদৌ প্রয়োজন আছে?'

'অন্তত একজন বাবুর্চি ও বেয়ারারের প্রয়োজন তো অবশ্যই আছে।'

'আমাদের বেয়ারারের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, আমরা দুজনই রান্না করা উপভোগ করি।'

'সেক্ষেত্রে আপনি একজন বাবুর্চি কাম বেয়ারার রাখতে পারেন। একই লোক দুটি কাজ করবে। খুবই আধুনিক চিন্তাধারা। এছাড়া আছে মালি, সুইপার এবং কাপড়চোপড় ধোয়ার জন্য একজন ধোপা। আপনার নিশ্চয়ই একজন ড্রাইভারেরও প্রয়োজন পড়বে।' মিসেস পুরী ভুরু কুচকালেন। 'ভালো একজন ড্রাইভার থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, 'একজন পাকা ড্রাইভার, পরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম পরা।'

'এখনো আমার গাড়ি নেই। অতএব ড্রাইভার রাখার প্রশ্ন অবান্তর।'

'কিন্তু আপনার যদি কোনো গাড়ি ও ড্রাইভার না থাকে তাহলে আপনি কী করে বিভিন্ন জায়গায় যাবেন?' মিসেস পুরী বললেন।

পাঞ্জাব সিং এর পুত্র বলবিন্দর সিং, ট্যাক্সি ড্রাইভারদের যুবরাজ, তোমার গোঁফ যাতে কখনো সাদা রং ধারণ না করে! তোমার লিভার যাতে কখনো সিরোসিসে আক্রান্ত না হয়। কিংবা তোমার অমূল্য সম্পদ হিন্দুস্থান

অ্যামবেসেডর গাড়িটি যাতে আর কখনো দুর্ঘটনায় গুঁড়িয়ে না যায়—যেরকম একবার ঘটেছিল ম্যাঙ্গো ফ্রুটি ড্রিংকবাহী ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে। যদিও দিল্লিতে আমার প্রথম বছরের কথা আমার মনে আছে, সারাক্ষণ ট্রাফিকের অব্যবস্থা ও নৈরাজ্যের কথা ভেবেছি। আমার দ্বিতীয় দফা দিল্লিতে অবস্থানের সময় আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে, ট্রাফিক আসলে নিয়ন্ত্রিত হয় কঠোর নিয়মে। রাস্তার ডানদিক বৃহৎ যানের ড্রাইভারের করায়ত্ত। বাস জায়গা করে দেয় ভারী ট্রাককে। অ্যামবেসেডর গাড়ি বাসের পথ ছেড়ে দেয়, আর বাইসাইকেল চালক পথচারী ছাড়া সবকিছুর জন্য পথ ছেড়ে দেয়। ভারতীয় জীবনের অন্যান্য অনেক দিকের মতো রাস্তায় সবলের অধিকারই চূড়ান্ত।

বলবিন্দর সিং একজন ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ। সে তার নিজের গুরুত্বের ওপর আর কোনোকিছুকে প্রাধান্য দেওয়ায় বিশ্বাস করে না। পরিস্থিতি তাকে বাস ও ট্রাককে পথ করে দিতে বাধ্য করার অবস্থায় ফেললেও সে কখনো নতুন মারুতি ভ্যানকে পাশ কেটে যেতে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। যদিও মারুতি ভ্যানগুলোর আকৃতি তার অ্যামবেসেডর ট্যাক্সির চেয়ে দীর্ঘ, কিন্তু তেমন ভারী নয়। শত হলেও বলবিন্দর সিং একজন ক্ষত্রিয়, যোদ্ধা এবং পূর্বপুরুষদের মতো কোনোকিছুতে সে ভয় না পাওয়ার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ। অ্যামবেসেডর গাড়িটি তার রথ, তার বর্শা ও তরবারি। যানজট এড়িয়ে পথ করে নেওয়া তার কাছে অন্য ট্যাক্সির সঙ্গে মুরগি ধরার মতো খেলা। বলবিন্দর সিং পথের রাজা।

অথবা বলা যায়, সে তাই ছিল। দিল্লিতে পৌঁছার এক মাস পর বলবিন্দর সিং ও আমি দুর্ঘটনার কবলে পড়ি। স্বাভাবিকের চাইতে সেই মোড়টিতে কফ ও পানের পিকের বেশি ছড়াছড়ি, ম্যাঙ্গো ফ্রুটি ড্রিংকবাহী মারুতি ভ্যানে ধাক্কা দেয় অ্যামবেসেডর এবং বনেট গড়িয়ে পড়ে ম্যাঙ্গো ড্রিংক। কেউ আহত হয়নি। বলবিন্দর সিং নির্লিপ্তভাবে বলে, 'মি. উইলিয়াম, জীবনে ছ'বার আমি দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছি। কিন্তু একবারও মরিনি।'

যদিও লোকটিকে আমি পছন্দ করি, অলিভিয়া খুব শিগ্‌গির তার খুঁত বের করে যে, বলবিন্দর সিং নানাভাবে আকর্ষণহীন বৈশিষ্ট্যের লোক। সে পাঞ্জাবি, শিখ, প্রাচ্যের সুপুরুষ। সে পান চিবোয় এবং জানালা দিয়ে পিক ফেলে, যার লাল দাগ লেগে থাকে গাড়ির ডান দিকে। রিকশাগুলোকে ফুটপাতের দিকে তাড়িয়ে এবং কাগজের টুকরো কুড়ানো ছেলেদের নর্দমার দিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার সময় মুখে বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করে। ট্রাফিক লাইটে গাড়ি থামলে সে ট্যাক্সি থেকে বের হয়ে যায় পেশাব করতে

এবং কথা বলার সময় অণ্ডকোষে চুলকায়। বলবিন্দর সিং রিপুপরায়ণ। দিল্লির রাস্তায় চলতে তার দৃষ্টি শাড়ি পরা মেয়েদের আপাদমস্তক লক্ষ করে। মোটর সাইকেলের পিছনে বসে থাকা মোটা শিখ মহিলাদের প্রতি তার চরম বিতৃষ্ণা। সপ্তাহে দুদিন অলিভিয়া যখন গাড়িতে থাকে না, তখন সে দিল্লির রেডলাইট এরিয়া জিবি রোডে নিয়ে যেতে চায়: 'জাস্ট লুকিং' সে বলে। 'দিল্লি লেডিস ভেরি গুড। তাদের স্তন আমের মতো।'

তবু তার নিজস্ব নীতিবোধ আছে। ঠিক তার ইংরেজ প্রতিপক্ষের মতো। কঠোর পরিশ্রমে সে বিশ্বাসী। আলোকিত স্থানে ভিক্ষুকের ভিড় দেখে সে বিস্মিত হয়। 'এই লোকগুলো কাজ করছে না কেন?' সে প্রশ্ন করে। 'দে হ্যাভ টু আর্মস অ্যান্ড টু লেগস। দে নট হ্যান্ডিক্রাফটেড।'

'হ্যান্ডিক্রাফটেড?'

'যেমন পা নেই, অথবা একটি কান আছে।'

'তুমি বলতে চাও হ্যান্ডিক্যাপড?'

'ইয়েস। হ্যান্ডিক্রাফটেড। শিখরা এটা পছন্দ করে না। শিখরা কঠোর পরিশ্রম করে। টাকা কামাই করছে, গাড়ি কিনছে।'

আমাদের দিকে দ্রুতগতিতে বাস আসছে তা অগ্রাহ্য করে সে ক্ষিপ্রতার সাথে স্টিয়ারিং ঘুরায়। 'এরপর শিখরা হুইস্কি পান করে, টেলিভিশন দেখে, তন্দুরি চিকেন খায় এবং জিবি রোডে যায়।'

বাড়িটির অবস্থান একটি ছোট্ট চৌকোনো জায়গায়। গরম, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছপালা বেষ্টিত এবং লনের চারপাশে চাঁপা ও অশোক ফুলের সারি। প্রতিদিনের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য এটি।

সকালে উন্মুক্ত নীল আকাশের নিচে চাকররা ঘাসের ওপর ভারী পা ফেলে যায় অথবা কাজ শেষ হয়ে গেলে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বসে গল্প করে, তাস খেলে। এরপর প্রায় ন'টার দিকে সকালের শান্তি বিনষ্ট হয়ে যায় সাইকেলের চাকা লাগানো ভ্যানওয়ালাদের মিছিলের কারণে। প্রত্যেকের নিজস্ব ডাক আওয়াজ আছে: 'পেপার ওয়ালা, পেপার ওয়ালা' (পুরনো সংবাদপত্রের ক্রেতা), এরপর হয়তো আওয়াজ দেবে ফল বিক্রেতা 'আম, লিচু, কলা, পেঁপে'। রুটি ও সবজি বিক্রেতাও আসবে। আমার প্রিয় হচ্ছে ধনুকর, যে পুরনো লেপতোষকের তুলা ধুনিয়ে পুনরায় নরম ও ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। রোববার সকালে ভালুক নাচিয়ের আগমন ঘটে। তার কাছে দুটো ঢোল থাকে এবং যখন সে ঢোল বাজাতে শুরু করে তখন পুরো চত্বরে ছুটে আসে ছোট ছেলেমেয়েরা। বিকেল হবার আগেই অ্যাকর্ডিয়ান নিয়ে

আসে এক অন্ধ ব্যক্তি। সে সুর ধরে এবং কাওয়ালি গায়। মাঝে মাঝে ধনী লোকরা তাদের চাকরদের হাতে মুঠিভর্তি খুচরা পয়সা পাঠায় তার জন্য।

পড়ন্ত বিকেলে বিশ বা ত্রিশটি গরুর একটি পালকে দেখা যাবে চত্বর অতিক্রম করতে, তারা বাড়িটির পিছনের গলি দিয়ে ধূলি উড়িয়ে এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে। আর কোনো গরুর পাল চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে আশেপাশের কোনো বাড়ির চাকরের সাইকেলে ধাক্কা খায়, যারা খান মার্কেটে বাজার সেরে ফিরে আসছে। এরপর সংক্ষিপ্ত ভারতীয় গোধূলি: ফ্যাকাসে লাল সূর্য গাছের সারির আড়ালে অস্ত যাচ্ছে; লাকড়ি ও ঘুটে পোড়ানোর গন্ধ, গাছের ডালে চড়ুই পাখি ও ময়নার দিন শেষের কিচিরমিচির এবং ঘুগড়া পোকার ঝিঁঝিঁ শব্দ।

রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলে শোনা যাবে চৌকিদারের হাঁকডাক ও মাটিতে লাঠি ঠোকা ও হুইসেলের শব্দ। দিল্লিতে আমাদের এই অংশে কখনো কোনো ডাকাতি হয়নি, এর ফলে চৌকিদার নিয়োগ করা এক ধরনের বিলাসিতা।

কিন্তু মিসেস পুরীর মতে, ঠাটবাট বজায় রাখা জরুরি।

ঠাট বজায় রাখার ব্যাপারে বলবিন্দর সিং এর দৃষ্টিভঙ্গিও বেশ কঠোর।

'ইউ আর এ ব্রিটিশার', প্রথম সাক্ষাতে সে আমাকে বলে। 'আই নো, ইউ আর এ ব্রিটিশার।'

দিল্লিতে আমাদের অবস্থানের প্রথম সপ্তাহ শেষের এক বিকেল। আমরা সবে পৌঁছেছি এবং বিদেশিদের নতুন আগমনের সাথে জড়িত ঝামেলাগুলো শেষ করতে ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে দৌড়াদৌড়ি করছি। ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসে সাক্ষাতের জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বিলম্বে। সেখানেও বলবিন্দর সিং এর অনুমান প্রশ্নহীন ছিল না। আমাকেও কথা বলতে হয়।

'তুমি কী করে বুঝলে যে আমি ব্রিটিশ?'

'বিকজ, ইউ আর নট স্পোর্টি,' বলবিন্দর সিং এর উত্তর। 'আপনি খেলতে পছন্দ করেন না।'

'আমি খেলাধুলা বেশ পছন্দ করি', তাকে বলি। 'প্রতিদিন আমি দৌড়াই। গ্রীষ্মে সাঁতার কাটি...'

'কোনো ব্রিটিশরাই খেলতে পছন্দ করে না।' সিং তার রায়ে অবিচল।

'আমার দেশের বহু লোক খেলাধুলার প্রতি একনিষ্ঠ।' আমি আবার বলি।